স্টেডিয়ামের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই ...

দুলাল মাহমুদ

এখন স্টেডিয়াম পাড়ায় গেলে বড্ড কষ্ট হয়। আগের মতো আর প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায় না। সবকিছু কেমন যেন বদলে গেছে। অবশ্য সময় নামক চোরা স্রোতে ভেসে যায় প্রতিদিনের দৃশ্যপট। অমলিন থাকে না কোনো কিছুই। তারপরেও স্টেডিয়াম এলাকায় একটা প্রাণোচ্ছ্বল দৃশ্যপট আছে, যা অনেকটা চিরন্তন। এর মেজাজ ও মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। হরেক রকম খেলাধুলা, হৈ-হুলে-ড়, তুমুল আড্ডাবাজি এ এলাকার এক অন্তরঙ্গ প্রতিচ্ছবি।

সন্ধ্যার পর স্টেডিয়াম চত্বরে পা রাখলে দেখতে পাওয়া যায় ছোট ছোট জটলা। জটলাকারীদের গুলতানি মারা ছাড়া দৃশ্যত কোনো কাজ নেই। হয়ত কারো ঘরে চুলোও ঠিকমত জ্বলে না কিংবা জীবনে তাদের নানা জটিলতা, তবুও ঘর বা পারিবারিক জীবন তাকে আটকে রাখতে পারে না। সবকিছু ভুলে স্টেডিয়ামের আড্ডায় তার সামিল হওয়া চাই। এ ব্যাপারে কোন সংশয় নেই যে, এঁদের সকলেই ক্রীড়া অন্তঃপ্রাণ। খেলা দেখা, দেশ-বিদেশের খেলাধুলার খোঁজ-খবর রাখা এবং তা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায় মেতে ওঠা এদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। তাদের জীবনের অধিকাংশ বেলা খেলায় খেলায় হলো সারা। এদের অনুপস্থিতিতে স্টেডিয়াম চত্বর মনে হয় নিস্প্রাণ।

দিনের পর দিন স্টেডিয়াম চত্বরে আড্ডাবাজদের দেখে আসছেন সবাই। বিকেলের পর জমজমাট হয়ে উঠাটা স্টেডিয়াম এলাকার নিত্যদিনের ছবি। অফিস ফেরতা কর্মজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, বেকার যুবক সহ নানা পেশার নানা বয়েসী মানুষ, যাদের রক্তে ঢুকে গেছে খেলাধুলার বীজ, তাদের অন্তত প্রতিদিন একবার স্টেডিয়াম এলাকায় ঢুঁ না মারতে পারলে পেটের ভাত হজম হয় না। স্টেডিয়ামে যদি কোনো খেলা থাকে তাহলে খেলার পর জমে ওঠে আড্ডা। খেলার হারজিত নিয়েই আড্ডা সরগরম হয়ে ওঠে। এরপর ক্লাবগুলোর হাড়ির খবর আর খেলোয়াড়দের নাড়ি-নক্ষত্রকে কতটা জানেন, তা নিয়ে চলে মতবিনিময়। যেসব খবরা-খবর অনেক সাংবাদিকও রাখেন না। এসব খবরে এঁদের কারো কোনো উপকার না হলেও তারা এক ধরনের আত্মতৃপ্তি পান। নিজের জীবনে এরা 'জিরো' হলেও ক্রীড়াঙ্গনের হিরোদের মাঝে খুঁজে নেন রোমাঞ্চকর অনুভূতি। প্রিয় ক্লাব আর প্রিয় খেলোয়াড়ের সাফল্যে তারা হয়ে উঠেন আনন্দে উচ্ছ্বল। মনে করেন, এটাই তাদের নিজের সাফল্য। এসব আড্ডাবাজের অধিকাংশই ক্লাব সমর্থক। স্টেডিয়াম চত্বরের জটলাগুলোও ক্লাবকেন্দ্রিক। ক্লাবই তাদের ঘর, ক্লাবই তাদের সংসার। তারা নিজেদের এই ঘর-সংসারের জিম্মাদার মনে করেন। যে কারণে নিজের ঘরের প্রতি তারা যতটা না মনোযোগ, তার চেয়ে বেশি আপন মনে করেন ক্লাবকে। ক্লাবকে ঘিরেই তাদের যাবতীয় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। এসব নিয়েই তারা আড্ডায় আড্ডায় কাটিয়ে দিচ্ছেন জীবনের মূল্যবান দিনগুলো। এ জন্য তাদের একটুও আফসোস নেই। কেননা তাদের নেই কোনো প্রাপ্তির প্রত্যাশা। যেখানে কোনো স্বার্থ থাকে না, সেখানে ভালবাসা হয় গভীর। এই ভালবাসা নিয়েই তাদের প্রতিদিনের জীবন। তারা সবচেয়ে সুখী, যখন কোনো সুখবর থাকে তাদের প্রিয় ক্লাবের। এমনকি গুজবটাও করে দেয় তাদের ভালবাসাকে সার্থক।

এ তো গেল একদিক। আরেক ধরনের আড্ডা হয় স্টেডিয়াম এলাকার বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন আর রেস্তোরাঁগুলোকে ঘিরে। সন্ধ্যায় রঙ যত গাঢ় হয়, ততই মশগুল হয় এই আড্ডাগুলো। নানা কিসিমের সংগঠক, সাবেক ও বর্তমান ক্রীড়াবিদ, হালের খেলোয়াড়, সাংবাদিক, ব্যর্থ ক্রীড়াবিদ ও গভীর ক্রীড়ানুরাগীরা এই আড্ডায় সমবেত হন। উদ্দেশ্য একটাই-খেলাধুলা। কখনো-সখনো অন্য বিষয় উঠে এলেও তা খুব একটা স্থায়ী হয় না। এ আড্ডার মানুষগুলো একটু অন্যরকম। তারাও কোনো কিছু পাওয়ার আশায় স্টেডিয়ামে আসেন না। আসেন প্রাণের রসদ যোগাতে। তবে তাদের প্রতিদিনের চিন্তা-ভাবনায় খেলাধুলা। বিনোদনের আরো অনেক দুয়ার খোলা থাকলেও খেলাধুলাই তাদের অষ্ট প্রহরের স্বপ্ন। এই দলের বড় অংশ ক্রীড়া সংগঠক। কী করে দেশের খেলাধুলার মঙ্গল হয় কিংবা নিজের ক্লাব কীভাবে সাফল্য পেতে পারে, তা নিয়ে তাদের অন্তহীন গবেষণা। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতেই তারা ব্যস্ত। খেয়ে না খেয়ে তারা মুখ বুঁজে স্টেডিয়ামে বা ক্লাবে পড়ে থাকেন। সংসার কীভাবে চলছে, সেটার তারা খোঁজও রাখেন না। নিবেদিতপ্রাণ এই ক্রীড়া সংগঠকরা বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছেন এই প্রাঙ্গণে। তাদের জীবনে কোনো উজ্জ্বলতা নেই। মঞ্চের নেপথ্যের কুশলীর মতো তাদের জীবন। তারা তারকা তৈরি করেন এবং তারকাদের পরিচালনা করেন, এটাই তাদের জীবনের আনন্দ। তাদের কেউ চিনুক কিংবা না চিনুক, তাতে কিছু আসে-যায় না। তবে স্টেডিয়াম এলাকার মূল সূতোটা তাদের হাতেই ধরা থাকে। বলা যায়, এই আড্ডাবাজরা দেশের খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। যে কারণে সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই তারা ছুটে যান স্টেডিয়াম এলাকায়।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় গোড়াপত্তন হয় ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামের। আর তখন থেকেই স্টেডিয়ামকে ঘিরে সূত্রপাত হয় আড্ডার। ধীরে ধীরে আড্ডাগুলো জমজমাট হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে স্টেডিয়াম এলাকায় ক্লাব গড়ে উঠার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে আড্ডাগুলো সমৃদ্ধ হতে থাকে। পঞ্চাশ দশক থেকে এখনো স্টেডিয়াম এলাকায় আড্ডার মৌতাতে মেতে আছেন – এমন লোকের সংখ্যাও বিরল নয়। খেলাধুলা নিয়ে আড্ডা

(৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সেই সময়ের মহিলারা সত্যিই অনেক কিছুই করেছেন বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। ধীরে ধীরে দেশের বয়স যতই বাড়ছে সুযোগ সুবিধা ততই বাড়ছে। সেই তুলনায় কিন্তু আমি বলব খেলাধুলায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে না।

বর্তমান সময়ের অভিভাবকরা অনেক বেশি উদার। তারা চান তাদের সন্তান যেন লেখাপড়ায় পারদর্শিতার সাথে সাথে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন। খেলাধুলায় অংশ নিয়ে নিজেদেরকে, সেই সাথে দেশকে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে পরিচিত করতে পারে। ঢাকা সহ বিভিন্ন মফস্বল শহরে রয়েছে একটি করে কভার্ড কোর্ট, ঢাকার ক্লাবগুলি মেয়েদের খেলাধুলার ব্যাপারে উৎসাহী। স্টেডিয়ামের সংখ্যা বাড়ছে, ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে। ধানমন্ডিতে রয়েছে বিশাল সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপে-ক্স। আবারো বলব সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে অনেক অনেক গুণ, কমিউনিকেশন ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে, মহিলা প্রশিক্ষক এর সংখ্যা বেড়েছে। বিগত দিনের দেশ সেরা খেলোয়াড়রা এখন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রশিক্ষকের চাকুরি পেয়েছেন-তারপরও কেন আমরা মেয়েরা বর্তমান সময়ে কম অংশগ্রহণ করছি-বা আমাদের মেয়েদের পারফরমেন্স আশাব্যঞ্জক নয়। এর জন্য আসলে কারা দায়ী। অংশগ্রহণকারীরা নাকি অভিভাবকরা, নাকি সংগঠকরা?

বর্তমান সময়ে শো-বীজে যেভাবে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে ঠিক তেমনিভাবে ক্রীড়াঙ্গনে মেয়েদের অংশগ্রহণ কমেছে। অনেক অভিভাবক মনে করেন খেলাধুলায় অনেক বেশি পরিশ্রম, মেয়ের চেহারা খারাপ হয়ে যাবে। অনেকে সামাজিক নিরাপত্তার অভাববোধ করেন। আজ প্রচন্ড যানজটের কারণে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে মেয়েকে অনুশীলন করাতে নিয়ে যেতে পারেন না। ফিনানশিয়াল ব্যাপারটিও অনেককে আশাহত করে।

আমি আমার ব্যাপারেই বলি, সত্তর দশকের শেষভাগ থেকে আশির দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত একা একাই ঢাকায় বাসা থেকে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে গেছি প্র্যাকটিস করতে (ব্যাডমিন্টন/টেবিল টেনিস) কিন্তু নব্বুই দশকের শেষে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমার নিজের মেয়েকে একা পাঠাতে পারছি না প্র্যাকটিসে-আমাদের সময় এবং এখানকার সময়ের অনেক ব্যবধান। দেশে যে সরকারই আসুক না কেন তাকে প্রথম খাওয়া-পড়া, বাসস্থানের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সুস্থভাবে মানুষকে বাঁচবার জন্য যা প্রয়োজন তা করার অধিকার তাকে দিতে হবে। যে দেশ জনসংখ্যায় এত ধনী সে দেশ কেন প্রতিটি সেক্টরে ধনী হতে পারবে না। শুধু ক্রিকেট নয় আমরা বাংলাদেশীরা যেন প্রতিটি খেলায় এগিয়ে যেতে পারি উন্নত করতে পারি নিজেদের পারফরমেন্স তার জন্য অভিভাবক, ক্লাব কর্মকর্তা, খেলোয়াড়রা নিজে এবং সর্বোপরি সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তবে আমাদের দেশের মহিলারা নিজের দেশকে বিশ্ববাসীর কাছে সুনামের সাথে পরিচিত করতে পারবে। ❒

কামরুন্নাহার ডানা
স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া।

(৪৫ পৃষ্ঠার পর)

তাদের প্রধান বিনোদন। এ আড্ডায় পাওয়া যায় দেশের খেলাধুলার অনেক অলিখিত ইতিহাস আর টুকরো টুকরো মজার স্মৃতি। বলা যায়, দেশের ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম আকর্ষণ এই আড্ডা।

আশির দশকের শেষ দিকে স্টেডিয়াম অঙ্গন থেকে ক্লাবগুলো সরিয়ে নেয়া হয়। এ সময় ক্লাবকেন্দ্রিক আড্ডাগুলো কিছুটা হলেও হোঁচট খায়। বিশেষত মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স, আজাদ স্পোর্টিং, ওয়ারীর মতো জনপ্রিয় ও বনেদি ক্লাবগুলো সরে যাওয়ায় স্টেডিয়াম এলাকা অনেকটা প্রাণহীন হয়ে যায়। তবে আড্ডা থেমে যায় নি। সংখ্যা হ্রাস পেলেও আড্ডার ধারা অব্যাহত থাকে। কেননা, জাতীয় স্টেডিয়ামে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সকলকে মাতিয়ে রাখে। তবে ঐ সময়টাতে স্টেডিয়াম এলাকার যে কোন আড্ডারই প্রাণ ছিলো ফুটবল। ফুটবল এমন এক খেলা, যার স্বপ্ন দোলায় দোলে সারা দেশ। তাই ফুটবল নিয়ে মাতামাতির ছিল না কোন শেষ। ফুটবল খেলোয়াড় আর ফুটবলের খবরই ছিলো এ পাড়ার আড্ডাগুলোর বিষয়বস্তু। নব্বই দশকের শেষে এসে ম্রিয়মান হয়ে যায় আড্ডাগুলো। এখন স্টেডিয়াম এলাকায় আড্ডাবাজদের তেমনভাবে চোখে পড়ে না। প্রায় চার দশকের ঐতিহ্য যে আড্ডা, তা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। এর কারণ ফুটবল। অনেকটা ফুটবলবিহীন হয়ে পড়েছে ঢাকা নগরী। হ্রাস পেয়েছে ফুটবল ক্রেজ। প্রথমত ফুটবলের দুর্বল ব্যবস্থাপনা। দ্বিতীয়ত, এই শূন্যতায় ক্রিকেটের আড়ালে পড়ে গেছে ফুটবল। ক্রিকেট জনপ্রিয় হলেও ফুটবলের স্থান দখল করতে পারে নি। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা একটা নির্দিষ্ট বলয়ে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ফুটবল সর্বজনপ্রিয়। ফুটবল সহজেই সাধারণ মানুষের মন জয় করে নিতে পারে। যে কেউ ফুটবল নিয়ে সহজেই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন। ক্রিকেট নিয়ে সেটি সম্ভব নয়। সঙ্গত কারণে ফুটবলের অনুপস্থিতিতে স্টেডিয়াম থেকে আড্ডাগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন স্টেডিয়াম এলাকা ঝকঝক করলেও আড্ডা না থাকায় প্রাণের আমেজ পাওয়া যায় না। তবে এই আড্ডাগুলো ফের না জমে উঠলে দেশের ক্রীড়াঙ্গনও অনুজ্জ্বল থেকে যাবে। আর দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে উজ্জ্বলতা দিতে পারে ফুটবল। ফুটবল ফিরে আসুক তার স্বরূপে, সেই সঙ্গে স্টেডিয়াম এলাকার চিরপরিচিত আড্ডাগুলো হয়ে উঠুক জমজমাট। আমরা সেই আড্ডার প্রতীক্ষায় থাকলাম। ❒

সম্পাদক, পাক্ষিক ক্রীড়া জগত।
সভাপতি, বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি।

‘পড়শী’তে আপনার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিন
আপনার পণ্যের খবর পৌঁছে যাবে
প্রবাসী বাঙালীর ঘরে ঘরে
বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য
আমাদের ওয়েব সাইটে আসুন
www.porshi.com

বে এরিয়াতে কামরুন্নাহার ডানা

বাংলাদেশের খেলাধুলায় মহিলারা কোথায়

জুনের প্রথমদিকে বে-এরিয়াতে ঘুরে গেলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস খেলোয়াড় কামরুন্নাহার ডানা। এসেছিলেন টরন্টোতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক এসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগদান করতে 'পড়শী'র নিয়মিত ক্রীড়া লেখক দুলাল মাহমুদের সাথে। দুলাল যদিও ইস্ট কোস্ট ঘুরে চলে গিয়েছেন দেশে, ডানা ঘুরতে এসেছিলেন ওয়েস্ট কোস্টও। ১৯৮১ সালে ডানা প্রথম জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর একের পর এক শিরোপা অর্জন করেছেন। ১৯৮২ ও ১৯৮৪ সালে ট্রিপল ক্রাউন অর্জন করেন একক, দ্বৈত ও মিশ্র দ্বৈত চ্যাম্পিয়ন হয়ে। জাতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় স্বামী শেখ আবুল হাশেমের সাথে মিশ্র দ্বৈতে প্রাধান্য বজায় রাখেন ১৯৯২ সাল অবধি। দু'জনেই ব্যাডমিন্টনে অসংখ্য শিরোপা জয় করেছেন ১৯৯২ সাল পর্যন্ত। জাতীয় দলের ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন অনেকগুলো দেশে। কামরুন্নাহার ডানা খেলোয়াড় ছাড়াও ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া লেখক। বর্তমানে তিনি মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ক্রীড়া লেখক সমিতির সহ-সভাপতি। ১৯৮৭ সালে ক্রীড়া পরিষদের 'সেরা ব্যাডমিন্টন' খেলোয়াড় হওয়ার পর ১৯৯৯ সালে পান দেশের সর্বোচ্চ শিরোপা 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার'।

বে-এরিয়াতে ঘুরতে এলে 'পড়শী'র পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয় এ লেখাটির জন্য কামরুন্নাহার ডানাকে। মাত্র দু'দিনের সফর হলেও এরই মধ্যে কলম হাতে বসে পড়েন ডানা বাংলাদেশের খেলাধুলায় মহিলাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর আলোকপাত করতে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলাম তখনকার সময়ে মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ কতটুকু ছিল তা আমরা বর্তমান সময়ের সকলেই অবগত। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আমাদের মহিলাদের অনেক পর্দানশীন অবস্থার মধ্যে থাকতে হতো। মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবে, পর্দা করবে না, পুরুষদের পাশাপাশি বিভিন্ন সেন্টারে কাজ করবে, লেখাপড়া করবে, চাকুরি করবে এই প্রক্রিয়া আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে চিন্তাই করা যায় নি। সেই সময় আর নেই। আমাদের সকলের স্মরণীয়, বরণীয় বেগম রোকেয়া বিগত দিনের অন্দরের সেই দৈন্যদশা থেকে মহিলাদের বেরিয়ে আসার পথ দেখিয়েছিলেন। অন্ধকার জীবন থেকে আলোতে বেরিয়ে আসতে শিখিয়েছিলেন। শিক্ষার আলো দান করেছিলেন বলেই আজ আমাদের দেশের মহিলারা দেশ-বিদেশে সম্মানজনক অবস্থান নিয়ে নিজেদেরকে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করতে পারছে।

পঞ্চাশ/ষাট দশকে তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে আমাদের যে সকল মহিলারা ক্রীড়াঙ্গনে পদার্পণ করেছিলেন তারা যে খুব একটা সুখকর পরিবেশে আসতে পেরেছিলেন তা কিন্তু নয়। হাতেগোনা যে কয়েকটি পরিবারের মেয়েরা খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করত তাদেরকে অন্যরা একটু বাঁকা চোখেই দেখত।

সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। মেয়েরা শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, ক্রীড়াঙ্গন সব জায়গাতেই আস্তে আস্তে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারছে। কিন্তু বিগত দিনে সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যারা নিজেদেরকে নিজেদের সেক্টরে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন তাদের প্রতিষ্ঠা পাবার পথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়েই তারা অসাধ্যকে সাধন করেছিলেন। সুযোগ সুবিধাও তেমন কিছুই ছিল না। ক্রীড়াঙ্গনে যে সকল মহিলারা এসেছেন তাদের পরিবারের সদস্যদের সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণার জন্যই নিজেদেরকে মেলে ধরবার সুযোগ পেয়েছিলেন। খেলাধূলার জন্য তেমন কোন সুযোগ ছিল না। কারো থেকে কোনো পারিশ্রমিক পাবার নিয়ম ছিল না, দৌড়াবার সময় কোন রানিং সু ছিল না, দামী ব্যাডমিন্টন/টেবিল টেনিস র‍্যাকেট ছিল না, সিনথেটিক ট্র্যাক ছিল না, ইনডোর খেলাগুলির জন্য ইনডোর স্টেডিয়াম ছিল না। বাবা/মার অতি উৎসাহ ছিল না। তারপরও পঞ্চাশ-ষাট দশকে রাবেয়া তালুকদার, লুৎফুন্নেসা হক বকুল, জিনাত আহমেদ, কাজী জাহেদা আলী (অনেকের নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না বলে দুঃখিত) এদের ক্রীড়াঙ্গনে পদচারণা ছিল উলে-খ করবার মতো।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সদ্য মুক্তি পাওয়া দেশের নাগরিকরা কিন্তু হঠাৎ করেই মনের বলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এটা হয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে দেশকে সাজাবার অভিপ্রায়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা নতুন শক্তিতে বলিয়ান হয়ে সামনে এগুবার পথ খুঁজে পেয়েছিল। আর তাই স্বাধীন বাংলাদেশে খেলাধুলার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণ ব্যাপকহারে শুরু হতে থাকে।

এ্যাথলেটিক্সে সুলতানা কামাল (ষাট এর দশকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে ক্যারিয়ার), নাসিমা হামিদ, ডলি ক্রুন, রওশন আক্তার ছবি, হামিদা বেগম, সালমা রফিক, রাজিয়া সুলতানা অনু, শামীমা সাত্তার শিমু। ব্যাডমিন্টনে আমার সাথে রুমানা আহমেদ, শেহের বানু মুন্নী, মরিয়ম তারেক, টেবিল টেনিসে-মুনিরা রহমান হোসেন, জোবেদা রহমান লীনু, জিমন্যাস্টিক্সে-খুসী, লুসী, হিরু অতি পরিচিত এই নামগুলো আজও মুখে মুখে ফেরে। নিজ নিজ খেলায় ঐ সকল খেলোয়াড়রা নৈপুণ্য প্রদর্শন করে খেলাধুলায় উলে-খযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

দেশ স্বাধীন হবার পর একটা নতুন দেশে সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে